মূলপাতা

নাস্তিকতা নিয়ে লেখালেখি...

Asif Adnan

February 28, 2019

9 MIN READ

১২৪ হিজরির ঈদুল আযহার দিনে কুফার অধিবাসীরা বিচিত্র এক ঘটনার সাক্ষী হয়। কুফায় বনু উমাইয়্যার নিয়োগকৃত প্রতিনিধি, খালিদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-কাসরী ঈদের খুতবায় ঘোষণা করেন –

হে লোক সকল! আপনারা কুরবানী করুন, মহান আল্লাহ আপনাদের কুরবানী কবুল করে নিবেন। আমি জা'দ ইবনু দিরহামকে কুরবানী করছি। সে মনে করে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম –কে খলীলরূপে গ্রহণ করেননি এবং মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথাও বলেননি। অথচ জা'দ যা বলছে মহান আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধে।

কথা শেষ করে মিম্বারের গোঁড়াতেই জা'দ ইবনু দিরহামকে খালিদ যবেহ করেন!

জা'দ ইবন দিরহামের ব্যাপারে ইমাম ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের সারমর্ম হল:

জা'দ ইবনু দিরহাম হল প্রথম ব্যক্তি যে দাবি করেছিল ক্বুরআন সৃষ্ট। পরবর্তীতে মুতা'যিলাদের মাধ্যমে এই কুফরি আক্বিদা প্রসার পায়। জা'দের কাছ থেকে এই আক্বিদা গ্রহণ করে জাহমিয়্যাহ ফিরকার সূচনাকারী জাহম বিন সাফওয়ান। জাহম বিন সাফওয়ানের কাছ থেকে এই আক্বিদা গ্রহণ করে বিশর আল-মুরাইসি। আর বিশর আল মুরাইসির কাছ থেকে গ্রহণ করে আহমাদ ইবনু আবি দু'আদ।

জা'দ ইবনু দিরহামের আক্বিদাকে পপুলারাইয করে জাহম বিন সাফওয়ান। এবং জাহম বিন সাফওয়ানের প্রচারিত আক্বিদার বিভিন্ন দিক বিভিন্নভাবে মু'তাযিলাসহ ভ্রান্ত আকিদার নানা ফিরকার উত্থানে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলার পবিত্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ভ্রান্তির শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় জাহম বিন সাফওয়ানের কাছে।

জাহম বিন সাফওয়ানের এ বিষাক্ত আক্বিদা কিভাবে গড়ে উঠেছিল? কোন থট প্রসেসের মাধ্যমে সে হাজার বছর ধরে উম্মাহকে তাড়া করে বেড়ানো এ ভ্রান্ত উপসংহারগুলোতে পৌছেছিল?

জাহমের পথভ্রষ্টতাঁর শুরুটা হয়েছিল নাস্তিকদের সাথে তর্কথেকে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম আল-বুখারীসহ অন্যান্য আরো অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী, সুমানিয়্যাহ নামের এক দল দার্শনিকদের সাথে ইসলামের পক্ষ নিয়ে বিতর্কশুরু করে। সুমানিয়্যাহরা ছিল ভারত ও খুরাসানের দিকের একটা সেক্ট, যারা বিশ্বাসের দিক থেকে ন্যাচারালিস্ট (naturalist) ছিল।

সুমানিয়্যাহদের সাথে জাহমের তর্কের ভিত্তি ছিল কালাম। রেটোরিক, লজিক। এ ধরণের তর্কের একটা উদাহরণ দেখা যাক। সুমানিয়্যাহরা জাহমকে প্রশ্ন করলো –

তুমি দাবি করো ইলাহ আছে?
-হ্যা
তুমি কি সরাসরি তোমার ইলাহকে দেখোছো?
-না
তাঁর কথা শুনেছো?
-না
কোন ঘ্রাণ পেয়েছো?
-না

কখনো তাঁকে স্পর্শ করেছো?
-না
কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতির প্রমান পেয়েছো?
-না
তার মানে তুমি আসলে জানো না যে সে ইলাহ?

...

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যাকে অনুভব করা যায় না, তার কি আসলেই অস্তিত্ব আছে?

জাহম কোন জবাব দিতে পারলো না। এ কথোপকথনের পর চল্লিশ দিন সে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকলো, কারণ সে বুঝতে পারছিল না সে আসলে কোন সত্ত্বার ইবাদাত করছে। তারপর একটা যুতসই উত্তর খুঁজে বের করলো। কিন্তু দেখা গেল এ উত্তরকে যুক্তির মাপকাঠিতে টিকিয়ে রাখতে হলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পবিত্র নাম ও গুণাবলীসমূহকে অস্বীকার করতে হচ্ছে। নিজের যুক্তির দার্শনিক ও যৌক্তিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য সে তাই করলো। এভাবে সে কুরআন সৃষ্ট হবার বিশ্বাসও গ্রহণ করলো, কিংবা বলা যায় করতে বাধ্য হল।

পুরো ব্যাপারটার শুরু কোথা থেকে?

অনেক আলিমগণের মতে, জাহম বিন সাফওয়ানের ফিকহের ব্যাপারে জ্ঞান ছিল, এছাড়া ইলমুল কালামেও তার দক্ষতা ছিল। কিন্তু আকিদার মজবুত ভিত্তি, শরীয়াহর দলিল, দলিলের সঠিক ব্যাখ্যা এবং সালাফ আস-সালেহিনের আসারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া নাস্তিকদের ঠিক করা কাঠামোর ভেতরে ঢুকে তাদের সাথে বিতর্কেযাবার কারণে সে নিজে বিভ্রান্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তী যুগ যুগ ধরে তার এসব বিভ্রান্তি উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিরকা ও ফিতনার জন্ম দিল, যার প্রভাব আজো চলছে। যতোটুকুবোঝা যায়, জাহমের প্রাথমিক নিয়্যাতও ভালো ছিল। তর্কবিতর্কের মাধ্যমে সে ইসলামকে ডিফেন্ড করতো, নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দিতো। আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু মৌলিক কিছু ভুলের কারণে এ কাজটাই উম্মাহর জন্য মারাত্মক এক ফিতনা হয়ে দেখা দিল।

২.

জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাদের সময়ে কাফিরদের সাথে তর্কের মূল বিষয় ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী ইত্যাদি নিয়ে। তাই এ বিতর্কথেকে জন্ম নেয়া বিচ্যুতিগুলো ছিল মূলত আক্বিদার এ বিষয়গুলো নিয়ে। আমাদের সময়েও নাস্তিকদের সাথে অনেক তর্কহয়। বেশ ক'বছর যারা ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন তাদের কাছে এটা কাজের বেশ জনপ্রিয় একটা এরিয়াও। আমাদের সময়ের নাস্তিকরাও, আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, 'স্রষ্টা এমন না হয়ে অমন না কেন?' – এধরনের প্রশ্নও করে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমাদের সময় কাফিরদের দ্বন্দ্বের মূল বিষয় আল্লাহর অস্তিত্ব না।

'আল্লাহ আছেন' –অ্যামেরিকা বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, চায়না বলেন, ইউ এন বলেন - বৈশ্বিক কুফর ব্যবস্থা এ বিশ্বাস মেনে নিতে রাজি আছে। কিন্তু আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবন চালাতে হবে, সমাজ চালাতে হবে, শাসন চালাতে হবে – এটা মেনে নিতে তারা রাজি না। ব্যাক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহ যেসব বিধিবিধান ঠিক করে দেয়, বুঝে- না বুঝে ভোগবাদের অনুসরণে ব্যস্ত আজকের পৃথিবী সেটা মানতে রাজি না। সামাজিক আচারআচরণ ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, সংস্কৃতি কিংবা ট্র্যাডিশানের ভিত্তিতে না – আজকের সমাজ এটা মানতে নারাজ। মুসলিমদের সমাজই এটা মানতে চায় না। আল্লাহর যমীনের আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করতেই হবে – এ কথাটা কারো পক্ষে আজ মেনে নেয়া সম্ভব না।

তাই আজ দ্বন্দ্বটা 'আল্লাহ আছেন কি না?' সেই প্রশ্ন নিয়ে না। দ্বন্দ্ব হল 'আল্লাহর শাসনের সীমানা কতোদূর?' তা নিয়ে।

একারণেই আপনি দেখবেন ইসলামের ঐ বিষয়গুলো নিয়ে কাফিররা সবচেয়ে বেশি আক্রমন করে যেগুলো বর্তমান ভোগবাদী, লিবারেল ওয়ার্ল্ডভিউ এর সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা হতে পারে নিকাবের আদেশ, স্বামীর আনুগত্য, মহিলাদের ঘরে থাকা, মুরতাদ হত্যার বিধান, কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করা, কুফর ও শিরকের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, জিহাদ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবমাননাকারীর শাস্তি ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়টা হল প্রতিনিয়ত একটা সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরে থাকার কারণে, আমরা মোটামুটি সবাই কাফিরদের এ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে ডিফল্ট হিসেবে নিয়েছি। কাফিরদের ঠিক করা মানবতা, শান্তি, অধিকার – ইত্যাদির সংজ্ঞা ও কাঠামোগুলো আমরা মেনে নিয়েছি। তারপর চেষ্টা করছি এ কাঠামোগুলোর ভেতরে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে খাপ খাওয়াতে। স্বাভাবিকভাবেই যখন পারছি না তখন আমরা এ বিধানগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করছি।

পুরো ব্যাপারটার সাথে জাহম বিন সাফওয়ানদের সিচুয়েইশানের অদ্ভূত মিল আছে। জাহমদের প্রথম ভুল ছিল অ্যারিস্টটোলিয়ান লজিকের প্রাথমিক মূলনীতিকে গুলো মেনে নিয়ে তর্কেঢোকা। তাদের দ্বিতীয় ভুল ছিল, আক্বিদা, নুসুস ও আসারের শক্ত জ্ঞান ছাড়াই বিতর্ককরা। তাদের তৃতীয় ভুল ছিল, তর্কেআটকে যাবার পর সেই তর্কছেড়ে না দিয়ে তর্কেজেতার জন্য নিজেদের বানানো নতুন নতুন যুক্তি নিয়ে আসা। চতুর্থ ভুল ছিল, সালাফ আস সালেহিনের অবস্থানের সাথে এসব যুক্তির অসামঞ্জস্য তাদের কাছে তুলে ধরার পর তাওবাহ না করে নিজেদের ভুলের ওপর পারসিস্ট করা। নিজের ইগো, আত্মমর্যাদার মিসপ্লেইসড ধারণা, 'মানুষ কী বলবে?' ইত্যাদির কারণে ভুল স্বীকার না করা। আজ হুবহু এ ব্যাপারটাই হচ্ছে।

ইসলামের সঠিক বুঝ ছাড়াই আমরা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি। সেটা করছে যাচ্ছি কাফিরদের মানবতা, অধিকার, স্বাধীনতা – ইত্যাদিকে সঠিক ধরে নিয়ে। তারপর ইসলামকে মানবিক, আধুনিক, সহজ, শান্তিপ্রিয় প্রমাণের জন্য, কাফিরদের কাছে নিজেদের 'সভ্য' আর 'অ-সন্ত্রাসী' প্রমাণের জন্য এমনভাবে কুরআন এ হাদীসকে ব্যাখ্যা করছি যেসব ব্যাখ্যা পুরোপুরি বাতিল। আর যখন ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে তখন আমরা ভুল স্বীকার করছি না। বরং নিজেরা আবোলতাবোল ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

দুটো পথ, দুটো ট্র্যাজেক্টরি – প্রায় হুবহু এক। যদিও মাত্রার ভিন্নতা আছে। দেখুন যেমনটা আগেই বললাম, জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের অনেকের প্রাথমিক ইন্টেনশন ভালো ছিল কিংবা বলা যায় আন্তরিক ছিল। এটা আহলুস সুন্নাহর অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আন্তরিক হওয়া এবং ভালো নিয়্যাত থাকা যথেষ্ট না। বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে। শারীয়াহর বিধান, হাদীসের বক্তব্য কিংবা কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করা কোন ডু-ইট-ইওরসেলফ প্রজেক্ট না, যেটা আমরা সবাই ইচ্ছেমতো করতে পারবো। প্রায় প্রত্যেকটা বাতিল ফিরকা কোন না কোন আন্তরিক লোকের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়গুলোর মধ্যে এমন অনেক অর্থ ও তাৎপর্যের এমন অনেক পর্যায় আছে, যার সবকিছু হয়তো আমাদের কাছে পরিস্কার না। আল্লাহর সব হুকুমের পেছনের হিকমাহ আমরা জানবো বা আমাদের জানাতে হবে – এমন কোন কিছু ইসলাম বলে না। এবং এসব বিষয়ে সূক্ষ কোন ভুলও এক সময় ভয়ঙ্কর বিচ্যুতিতে পরিণত হতে পারে, কারন ইবলিস অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আপনার-আমার চেয়ে অনেক আগানো। আমাদের দুর্বলতা কোথায়, আমাদের মনের অসুখগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সেটা সে খুব ভালোভাবেই জানে।

কাজেই কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ –

১) আক্বিদা ও শারীয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে বুঝ ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র সালাফ আস-সালেহিন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামগণের কাছ থেকে নেয়া।

২) তর্কেজেতার চেয়ে আকিদা ও দ্বীন হেফাযত করা লক্ষ কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া যতোটুকু গুরুত্বপূর্ন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করা।

৩) ইসলামকে বুঝতে হবে দলিলের ভিত্তিতে। যুক্তি, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়ানুভূতি – সব কিছু ওয়াহির অনুগামী হবে, উল্টোটা না। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক। কোন যুক্তি ছাড়া, কোন প্রমাণ ছাড়া। যদি আমার চোখ, কান, বা আকল (বুদ্ধি/যুক্তি) এক কথার সাক্ষ্য দেয়, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উল্টোটা বলেন তাহলে আমার চোখ, আমার কান, আমার আকল মিথ্যা বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলছেন – এটা বিশ্বাস করতে হবে। আসলেই বিশ্বাস করতে হবে।

৪) ইসলামকে 'দুনিয়াসম্মত'/দুনিয়া-কমপ্লায়েন্ট করা আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ দুনিয়াকে ইসলামী অনুযায়ী বদলানোর চেষ্টা করা।

৫) আল্লাহর ব্যাপারে, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা না বলা। এটা অনেক মারাত্মক একটা গুনাহ। এবং এটা চরম বিপর্যয়ের পথ খুলে দেয়।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত, অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলতে নিষেধ করেছেন । আর এটি সবচেয়ে গুরুতর নিষেধাজ্ঞাগুলোর অন্যতম। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ একে সর্বনিকৃষ্ট গুনাহর একটি হিসেবে গণ্য করতেন।

'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।' (তরজমা, সূরা আরাফ, ৩৩)

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল গুনাহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ফেলেছেন। এই আয়াতে তিনি চার শ্রেণির গুনাহর কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন ফাওয়াহিশের (কবীরা গুনাহ, যেমন যিনা ও ব্যভিচার) কথা, তারপর যুলুম, তারপর শিরক আর তারপর বলেছেন সর্বনিকৃষ্ট মাত্রার গুনাহর কথা–না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা, না জেনে তাঁর ব্যাপারে কিছু আরোপ করা। আল্লাহ শুরু করেছেন সবচেয়ে কমমাত্রার গুনাহ দিয়ে আর শেষ করেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্টমাত্রার গুনাহর কথা বলে।

আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু সেটা নিজেদের বুঝ, খেয়ালখুশি, আবেগ কিংবা পছন্দ অনুযায়ী করলে হবে না। সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভেতরে থেকেই করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে বোঝার ও মানার তাউফিক দান করুন। আমীন।